জন্মসার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

রঙ্গ-রসিক রজনীকান্ত

সাগরিকা সেনগুপ্ত

‘....কবে, তোমাতে হ’য়ে যাব আমার আমি হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব’বে ধারা
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে!’

এই ‘রসাল-নন্দনে’র স্পর্শ পাবার তীব্র অভীপ্সায় যে মানুষটি তাঁর অত্যন্ত সীমিত জীবনকাল প্রবল ঈশ্বর বিশ্বাসে ব্যয়িত করেছেন, ভক্তিভাবরসে আপ্লুত হয়ে জীবনের ‘তৃষিত মরু’ সংগীতসুধায় ভরিয়ে তুলেছেন, ঊনবিংশ শতকের সেই স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫ – ১৯১০)।

মনে রাখতে হবে, সময়টা ঊনবিংশ শতকের বহুল চর্চিত, বহু বিসংবাদিত ‘বাংলার রেনেসাঁ’র যুগ। জাজ্বল্যমান ভাস্কর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাচ্ছটায় বাংলার সংস্কৃতির আকাশ উদ্ভাসিত। তৎসত্ত্বেও রজনীকান্ত তাঁর আপন কবি প্রতিভার যে পরিচয় রেখে গেছেন, তা তাঁর ভক্তিনম্র শুচিতায় সমৃদ্ধ ও ভাস্বর। ভক্তিভাবের আধার স্বরূপ এই মানুষটি তাঁর সমসাময়িক কবি সংগীতকার অতুলপ্রসাদ সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পাশে সমজ্যোতিতে দীপ্তিমান ছিলেন, আজ তাঁর জন্মসার্ধশতবর্ষের প্রান্তে এসে তাঁকে স্মরণ না করে আমাদের উপায় নেই।

ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ এই চিরভক্ত মানুষটিকে ‘কান্তগীতি’র কল্যাণে আমরা প্রায় সবাই চিনি, কিন্তু তাঁর অসীম রসবোধে ও ব্যঙ্গ-কটাক্ষে যে তৎকালীন সমাজ বিদ্ধ হয়েছিল, সেই রসিক মন ও হাস্যকৌতুকের নিদর্শন সাধারণ মানুষের প্রায় অজানা। আমাদের এই রচনার অভিমুখ সেইদিকে। তবে সে প্রসঙ্গে যাবার আগে রজনীকান্তের সমগ্র জীবনের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত না করলে এ আলেখ্যর প্রতি অবিচার করা হবে।

রজনীকান্ত সেন (২৬ জুলাই ১৮৬৫ – ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০)

১৮৬৫ সালের ২৬ জুলাই পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামের বৈদ্যবংশে রজনীকান্তের জন্ম। সংগীতজ্ঞ পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ও সাহিত্যপ্রেমী মাতা মনোমোহিনী দেবীর তৃতীয় সন্তান ছিলেন রজনীকান্ত। ‘পদচিন্তামণিমালা’ (১৮৭৬) নামক ব্রজবুলিতে রচিত কীর্তনসমষ্টি এবং ‘অভয়া বিহার’ নামক শাক্ত গীতিকাব্যর রচয়িতা হিসাবে গুরুপ্রসাদ সেন অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। ফলত, সাহিত্য ও সংগীতের আবহাওয়াতেই রজনীকান্তর শৈশব অতিবাহিত হতে থাকে। শৈশবে তাঁর দস্যিপনা ও খেলাধুলোর প্রতি আকর্ষণ বিশেষ উল্লেখের দাবি করে। কিন্তু অতি অল্পসময় পড়াশুনায় ব্যয় করলেও তিনি পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্যলাভ করতেন, তাঁর দিনপঞ্জিতে যার নিদর্শন রেখে গেছেন তিনি –

‘...আমি কখনও বইপ্রেমী ছিলাম না। অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।’

প্রসঙ্গত, এন্ট্রাস পাশের পর তিনি প্রতি মাসে বৃত্তিলাভ করতেন। ১৮৮৩ সালে কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল থেকে এন্ট্রাস, ১৮৮৫-তে রাজশাহী কলেজ থেকে এফ.এ. এবং কলকাতা সিটি কলেজ থেকে ১৮৮৯-তে বি.এ. ও ১৮৯১-তে বি.এল. ডিগ্রি অর্জন করেন রজনীকান্ত।

কৈশোর জীবনে মা মনোমোহিনী দেবী রজনীকান্তের সাথে সাহিত্য নিয়ে আলাপ-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

আলোচনা করতেন, যা তাঁকে ভবিষ্যতে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীও অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন, তিনিও রজনীকান্তর কবিতা নিয়ে মতামত ও সমালোচনা ব্যক্ত করতেন। রজনীকান্তর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা কালীকুমারই রজনীকান্তর কাব্যগুরু। তাঁরই উৎসাহে শৈশবেই রজনীকান্ত কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই কবিতা রচনায় সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন। রজনীকান্ত রচিত কবিতাগুলি স্থানীয় 'উৎস', 'আশালতা', 'উৎসাহ' প্রভৃতি সংবাদ-সাময়িকীতে প্রকাশিত হত।

শৈশবকাল থেকেই রজনীকান্তর সংগীতের প্রতি বিশেষ টান ছিল। তাঁর সংগীতজ্ঞ পিতার সাহচর্য এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ উৎসাহিত করে তোলে। ভাঙ্গাকুঠির তারকেশ্বর চক্রবর্তী রজনীকান্তর বন্ধু ছিলেন। তারকেশ্বরের সংগীত সাধনাও তাঁর উপর বেশ প্রভাব ফেলেছিল। রজনীকান্ত তাঁর প্রচুর কবিতায় সুর যোজনা করে সেগুলিকে সংগীতের রূপ দেন। কলেজ জীবনে নানা অনুষ্ঠান-উৎসবে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বিখ্যাত কিছু গান তিনি লিখেছিলেন। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য –

'তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।'

এটি রাজশাহী গ্রন্থাগারের সমাবেশ উপলক্ষে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে রচনা করেছিলেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে রজনীকান্ত কালীসংগীত রচনা করে সবাইকে চমৎকৃত করেন।

পিতার স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার ফলে এবং জ্যাঠতুতো বড়োভাইদের অকাল প্রয়াণে আপাত সচ্ছল সেন পরিবারে প্রভূত আর্থিক-সংকট দেখা দেয়, সেই কারণেই আইনবিষয়ক বি.এল. ডিগ্রি লাভ করে রজনীকান্ত রাজশাহী কোর্টে ওকালতিতে যোগ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু আইন পেশার পাশাপাশি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনেই তাঁর বিচরণ ছিল বেশি। সংগীতের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহের কথা জানাতে গিয়ে তিনি শরৎ কুমার রায় (দীঘাপতিয়ার কুমার)-কে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, –

'কুমার, আমি আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসা করিতে পারি নাই। কোন দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম, আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।

– একান্ত অনুগত
শ্রী রজনীকান্ত সেন।'

পরবর্তীতে তিনি কিছুদিন নাটোর এবং নওগাঁ জেলায়ও অস্থায়ীভাবে মুনসেফের কাজ করেন। অবকাশকালীন সময়ে রজনীকান্ত রাজনাথ তারকরত্নর কাছে সংস্কৃত ভাষা শিখতেন, এছাড়া গোপালচন্দ্র লাহিড়ী (পাবনা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন।

রজনীকান্ত ব্যক্তিজীবনে উপর্যুপরি আঘাতে বারবার চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন। কিন্তু এই আঘাত তাঁর প্রবল ঈশ্বর বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারেনি। রজনীকান্ত ও হিরণ্ময়ী দেবীর চার পুত্র শচীন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, ভূপেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র এবং দুই কন্যা শতদলবাসিনী ও শান্তিবালা। ভূপেন্দ্রর অকাল প্রয়াণ তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, তবুও ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ রজনীকান্ত পরদিন রচনা করেন, –

'তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ-চাওয়া।...'

রজনীকান্তর খ্যাতি তাঁর কবিপ্রতিভার গুণে না গীতিকার হিসাবে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল, সেই দ্বন্দ্বে না গিয়ে বরং এ প্রসঙ্গে 'মহাজ্ঞানী মহাজন'-রা যা বলে গেছেন, সেই উদ্ধৃতিগুলি কিছু তুলে দেওয়া যাক।

১৯০২ সালে রজনীকান্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বাণী'র আত্মপ্রকাশ। এই বই-এর ভূমিকা লেখেন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। তিনি লিখেছিলেন, 'কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্ত পদাবলী কেবল সঙ্গীত।' ডঃ শিশির কুমার দাশ তাঁর 'সাহিত্যসঙ্গী'তে লিখে গেছেন – 'রজনীকান্তের রচনার প্রধান অংশ গান ...গানেই তাঁর সমস্ত ভাব ও চিন্তা প্রকাশিত। কল্যাণী (১৯০৫), অমৃত (১৯১০), আনন্দময়ী (১৯১০), বিশ্রাম (১৯১০), অভয়া (১৯১০), সদ্ভাবকুসুম (১৯১৩), শেষদান (১৯২৭) প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে অমৃত ও সদ্ভাবকুসুম নীতিকবিতা, অন্য সবই গান। রজনীকান্তের গানের প্রধান বিষয় ভক্তি ও দেশপ্রেম। তাঁর স্বদেশীগানে স্বাজাত্যবোধের মত্ততা নেই, আছে সহজ সরল মমতা।'

পল্লী-কবি রজনীকান্ত সমগ্র বঙ্গের জাতীয় কবি – 'কান্তকবি' হয়ে উঠেছিলেন তাঁর স্বদেশপ্রেমের গুণে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে, ৭ অগাস্ট বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতার টাউনহলে একটি সভায় বিলিতি পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন তৎকালীন বিখ্যাত নেতৃবর্গ। ভারতের সাধারণ মানুষ বিশেষত আহমেদাবাদ ও বোম্বাই-এর জনগণ ভারতে তৈরি কাপড় ব্যবহার করতে শুরু করেন, যেগুলি গুণগত মানের দিক থেকে বিলিতি কাপড়ের মতো অত সূক্ষ্ম ও মসৃণ ছিল না। ফলে কিছু সংখ্যক ভারতবাসীর

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

সুরসাধনায় কান্তকবি

মনে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। সেই ক্ষোভ প্রশমনে রজনীকান্তের লেখনীর ধার জন্ম দিল এক বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানের, —

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।...'

এই গানটি সম্বন্ধে সে কালের অতি সংবেদনশীল সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন, 'ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে, নিয়তির বিধান আছে।'

রজনীকান্তের গানগুলিকে মোটামুটিভাবে দেশাত্মবোধক, ভক্তিমূলক, প্রীতিমূলক ও হাস্যরসের গান — এই চারটি অঙ্গে বিন্যাস করা যায়। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বাণী'র প্রথম সংস্করণ কবিতা আকারে প্রকাশিত হলেও দ্বিতীয় সংস্করণে এবং 'কল্যাণী'র কবিতাগুলিতে রাগরাগিণী ও তাল সংযুক্ত করা হয়। ডঃ শিশির কুমার দাশ লিখেছেন, রজনীকান্তের ভক্তিগীতিগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। এই গানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য তাদের পাপবোধের তীব্রতা। আবার কবি হেমেন্দ্রলাল রায় 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'কান্তকবির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতা বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ ভক্ত এবং রসিক সকলেরই সমান উপভোগ্য — সকলেরই সমান আদরের বস্তু।' প্রখ্যাত গায়ক, প্রবন্ধকার ও সমালোচক সুধীর চক্রবর্তীও লিখেছেন, 'ব্যক্তি রজনীকান্তের চেয়ে তাঁর গায়কসত্তাই বোধহয় খুব বেশী জনাদৃত ছিল। বরাবরই একটানা বহুক্ষণ নিজের গান হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে ভালবাসতেন।' আবার লিখেছেন, 'অদৃশ্য ঈশ্বর করুণা আর বাস্তবের জননীকৃপার প্রতি অবিচল আস্থা — তাঁর জীবনযাপনের দুই অনপনেয় ভিত্তি। সেই সঙ্গে গভীর ভরসা মঙ্গলবোধের প্রতি।...কান্তবাণী স্বভাবত কোমল ও ভাবাবেগপূর্ণ...পাঠ্য কবিতা হিসাবে সেগুলি সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ...।'

আধ্যাত্মিক ভাবনায় বিভোল এই পরম ঈশ্বরভক্ত মানুষটির জীবনে জাগতিক বাস্তবতার চরম নিষ্করুণ কষাঘাত নেমে এল এবার। ১৯০৯ সাল, রাজশাহীতেই রজনীকান্তের নিদারুণ কণ্ঠরোগের সূচনা হল। সেই অবস্থায় তাঁকে রংপুরে যেতে হয় সেখানকার সরকারি উকিল রায়বাহাদুর ব্রজেন চাটুজ্যের বাড়িতে। সেখানে ওই জ্বালা যন্ত্রণা নিয়েও রায়বাহাদুরের অনুরোধে একটানা বহুক্ষণ গান গাইতে হয়, তারও পরে রাজশাহীতে ফিরে তাঁর পেশাগত কাজে সওয়াল জবাব দেওয়ার পর গলায় তীব্র ব্যথা, স্বরভঙ্গ ও খাদ্যগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। তখন তাঁর পরিবারের সদস্যরা জোর করে তাঁকে কলকাতায় পাঠান। জনৈক বৃটিশ ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তাঁর ল্যারিঙ্গস্ ক্যান্সার হয়েছে বলে শনাক্ত করেন। তারপর কলকাতার বিভিন্ন প্রথিতযশা ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়েও যখন রোগের ক্রমশ অবনতি হতে থাকে, তখন তিনি বারাণসীতে গিয়ে কিছুদিন থাকেন 'দৈব' ভেষজ ঔষধাদি উপায়ে রোগ নিরাময়ের জন্য। কোনও লাভ না হওয়ায় অবশেষে ১৯১০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে 'ট্রাকিওস্টমি' অপারেশন করান। এর ফলে কিছুটা আরোগ্যলাভ করলেও বাক্শক্তি চিরতরে হারান। অপারেশনের পরে জীবনের বাকি দিনগুলি ওই হাসপাতালেরই কটেজে অতিবাহিত করেন। তারপর প্রায় সাতমাস এই সংগীত-পিপাসু মানুষটি অসীম যাতনায় নির্বাক গানহীন দিনযাপনের বেদনায় রোজনামচা লিখতেন, আর গানে গানে ভরিয়ে তুলতেন তাঁর খাতা। এই চিকিৎসার খরচ চালাবার জন্য তিনি তাঁর 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র গ্রন্থস্বত্ব অত্যন্ত

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

বেদনার সঙ্গে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। এই সময়ে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শরৎ কুমার রায় তাঁকে আর্থিকভাবে যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষপর্বে, ১৯১০ সালের ১১ জুন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দেখতে মেডিক্যাল কলেজের কটেজে আসেন। রজনীকান্ত অভিভূত হৃদয়ে কাগজে লিখে কবিকে জানান, — "আজ আমার যাত্রা সফল হইল। তোমারই চরণ স্মরণ করিয়া, তোমারই 'কণিকা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'অমৃতে'র সন্ধানে ছুটিয়াছি। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার যাত্রা সফল হয়।" ওই সময়ে তিনি অসীম উৎসাহের সাথে হারমোনিয়াম বাজাতেন এবং তাঁর পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও কন্যা শান্তিবালা তাঁরই রচিত গান গেয়ে শোনাতেন। রজনীকান্তের একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, 'এই বেদনাময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মাকে শুদ্ধ করে তুলছেন' — এই বিশ্বাসে অটুট আস্থা রেখে তিনি তাঁর শারীরিক যন্ত্রণা সাময়িকভাবে ভুলে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি এই গানটি রচনা করেন, —

'আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে
গর্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।...'

তারপর এই গানটিকে কবিতা আকারে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। কবিগুরু প্রত্যুত্তরে (৩০ জুলাই, ১৯১০) রজনীকান্তর অলোকসামান্য প্রতিভা ও গৌরবময় ভূমিকার প্রশংসা করে চিঠি দেন, এও জানান যে এর মাধ্যমেই তাঁর অন্তরাত্মা শক্তি ও সাহস জুগিয়ে তাঁকে ব্যথা বেদনা থেকে মুক্ত রাখবে। এই অসম্ভব যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান ঘটে তার অল্প পরেই, ১৯১০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, রাত সাড়ে আটটায়।

১৯১০ সালে যখন রজনীকান্ত রোগশয্যায়, তখন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত' প্রকাশিত হয়। এই বইটি সর্বজন প্রশংসিত নীতি-কাব্য হিসাবে পরিগণিত হয়। 'অমৃত' কাব্যগ্রন্থটি কবি শরৎ কুমার রায়কে উৎসর্গ করেন।

'...নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা;
রুগ্ন ক্ষীণ, অবসন্ন এ প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হ'তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক'রেছে তুমি ছাড়া, আর কেবা পারে?
কি দিব কাঙ্গাল আমি? রোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মাল্য, বহু কষ্ট করি;
ধর দীন উপহার; এই মোর শেষ;
কুমার! করুণানিধে! দেখো, র'ল দেশ।

এই বইটি সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'তিক্ত পিলের পরিবর্তে রজনীকান্ত বালকদের এই অমৃতের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিকট এই জন্য ঋণী রহিলাম।'

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অক্লান্তকর্মা সম্পাদক, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টিকে রজনীকান্ত 'অমৃত' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা অমৃতের কণিকা, সন্দেহ নাই, রোগশয্যায় থাকিয়াও তিনি তাঁহার স্বদেশীগণকে এই অমৃত-কণিকাপানে তৃপ্ত করিতেছেন, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত।"

কবি অক্ষয় কুমার বড়াল বলেছেন, 'আপনার অমৃত পান করিলাম। এই উৎকট রোগে মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে যিনি এরূপ সুস্থ ও সবল কবিতা লিখিতে পারেন, তিনি বাণীর সামান্য সাধক নহেন। তিনি মনুষ্যের নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত নমস্য কবি।'

'অমৃতের কণিকা'র সামান্য একটি উদাহরণ —
'শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্রমাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?'

রোগশয্যায় কবি

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

‘অমৃত’ কাব্যগ্রন্থ যে কতটা সমাদৃত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই বইয়ের প্রথম প্রকাশের তিন-চার মাসের মধ্যে তিনটি সংস্করণ বের হওয়ায়।

রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’ কাব্যগ্রন্থর অনুপ্রেরণায় যে রজনীকান্ত তাঁর ‘অমৃত’ কাব্যগ্রন্থ লেখেন, সে কথা তাঁর রোগশয্যার রোজনামচায় লিখেও গেছেন, আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্রে অকপটে স্বীকারোক্তির কথা তো আমরা আগেই জেনেছি। শুধুমাত্র রবীন্দ্রানুসরণই নয়, সেই সঙ্গে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কবি কিছু সংস্কৃত নীতি-শ্লোক ও বাংলা, ইংরেজি গল্প থেকে কিছু ভাবও গ্রহণ করেন, এবং তিনি এও জানিয়েছিলেন, ‘...পুস্তকখানি যাহাতে স্কুলপাঠ্য হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।’

বস্তুত, রজনীকান্তের ‘অমৃত’ বইটিকে স্কুল পাঠ্যবই-এর তালিকাভুক্ত করার জন্য ‘দ্য স্টেটস্ম্যান’ দৈনিক পত্রিকা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাখে। দীনেশচন্দ্র সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতামত আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়াও ‘বসুমতী’, ‘হিতবাদী’, ‘বঙ্গবাসী’, ‘উপাসনা’, ‘সঞ্জীবনী’, ‘দ্য বেঙ্গলি’ ও ‘দ্য ইন্ডিয়ান নিউজ’ও এই আবেদনে সোচ্চার হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্ভবত সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি, নচেৎ রজনীকান্তকে তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনের জন্য ‘বাণী’ ও ‘কল্যাণী’র গ্রন্থস্বত্ব মাত্র চারশো টাকায় বিক্রি করতে হত না বলেই আমাদের ধারণা।

এরপরে কবির মরণোত্তর কালে (অক্টোবর, ১৯১০) বেরোয় ‘আনন্দময়ী’, যে বইয়ের সব রচনাই কবির রোগশয্যায় মেডিক্যাল কলেজের কটেজে লেখা, এমনকি ‘গ্রন্থকারের নিবেদন’ এবং ‘উৎসর্গ পত্র’ও লিখে রেখে যান। বইটি তিনি শরৎ কুমার রায়ের ভগ্নী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভাকে উৎসর্গ করেন। এ বইটি মূলত আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক চিরকরুণ গীতিকাব্য।

এরপরে ১৯১০ সালেই বেরোয় রজনীকান্তের হাস্যরসের গান ও কবিতা সংবলিত বই ‘বিশ্রাম’। রাজশাহীতে থাকাকালীন রজনীকান্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কণ্ঠে হাসির গান শুনে অনুপ্রাণিত হন। ফলত, আমরা তাঁর নিজস্ব হাস্যরসের সম্ভার পাই, যা বিষয়গত ও চরিত্রগত দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের থেকে স্বতন্ত্র। এই গ্রন্থটি একাধারে রজনীকান্তের ব্যঙ্গ চাতুর্য ও কৌতুকপ্রবণতার পরিচায়ক। তৎকালীন সমাজকে তিনি তীব্র শ্লেষে আঘাত করেছিলেন এই রচনাগুলির মাধ্যমে। ‘বিশ্রাম’-এর প্রথম কবিতা ‘একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল’ এমন একটি শ্লেষাত্মক কবিতা। বাঙালি সমাজে পূজার উৎসব আয়োজনের বাড়াবাড়িতে ভক্তিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না — এ কবিতা তারই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

‘... ...ধূপধুনো নৈবেদ্য এল, এল হুলুধ্বনি,
গরীব লোকের এল পাঁঠা, মোষ আন্‌লেন ধনী।
লোকারণ্য সঙ্গে নিয়ে এল হট্টরোল,
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।...’

কবি রজনীকান্তের একটি বিশেষ মানবিক গুণের নিদর্শন আমরা পাই তাঁর সমাজচেতনায়। এর উল্লেখ ব্যতিরেকে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের এই পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই জনপ্রিয় কবি গ্রামের নিরক্ষর মহিলাদের মাঝে শিক্ষাপ্রসারের জন্যও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরজন্য প্রাচীন, পুরাতনপন্থী ও শিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত গ্রামবাসীর অনুন্নত মনোভাবের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকেও বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার মোকাবিলা করতে হয়েছে বহুবার।

এই সমাজসচেতক কবির দৃষ্টিতে যখন তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কার, শিক্ষিত সমাজের বিকৃতি ক্রমশ ধরা দেয়, তখন তাঁর কাব্যভাণ্ডার উপভোগ্য ব্যঙ্গ ও গ্লানিমুক্ত নির্দোষ হাসির কবিতায় সমৃদ্ধতর হতে থাকে, যা শুধু ‘বিশ্রাম’ গ্রন্থেই নয়, ‘কল্যাণী’র কিছু কিছু কবিতাতেও তার পরিচয় রেখে যায়। ‘কল্যাণী’র ‘বুড়ো বাঙ্গাল’ কবিতা যেমন — (বুড়ো বাঙ্গালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি)

‘বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইল্যা দিছি পায়,
তোমার লগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়া উঠছে দায়।
আরসি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুলে বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায়?
... ...
বুড়া বুড়া কৈয়া ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্ কোর্‌চ পাগল?
যহন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেল্‌বো ক্যাম্‌তে? কৈয়া দাও আমায়?’

আবার ‘কল্যাণী’-রই ‘পুরাতত্ত্ববিৎ’ কবিতাটি লক্ষণীয়, —

‘রাজা অশোকের ক’টা ছিল হাতী
টোডরমল্লের ক’টা ছিল নাতি
কালাপাহাড়ের ক’টা ছিল ছাতি,
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।
আকবর সাহা কাছা দিত কিনা,
নূরজাহানের ক’টা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিম্বা পীনা,
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।’

সমাজের নানান জীবিকাকে ব্যবসায় পরিণত করা বাঙালির প্রতি কটাক্ষ করে বহু রচনা রজনীকান্তের হাত থেকে বেরিয়েছিল, যা তাঁর ‘বিশ্রাম’ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা নিম্নলিখিত কবিতাগুলি পাই, যেমন — ‘স্বর্গের খবর’, ‘মিউনিসিপাল ইলেক্‌শন’, ‘কেরাণী জীবন’,

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়'। এইসব কবিতায় সমাজদর্শনের রসসিক্ত অভিব্যক্তি আমাদের ভাবায়। আবার পৌরোহিত্য ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁর শ্লেষ –

'... ...আমাদের রুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ যত্নে সাবান কাচি,
আর, তালতলা চটি পেন্‌সন্ দিয়ে,
ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি।...' ('কল্যাণী')

বস্তুত, 'বিশ্রাম' গ্রন্থটি তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা সংবলিত গ্রন্থ হলেও তাঁর রসবোধের পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'বাণী', 'কল্যাণী' প্রভৃতি গ্রন্থেও। 'অভয়া' তাঁর এই দুই গ্রন্থের ন্যায়তত্ত্ব ও হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলিরই সংকলন, ১৯১০ সালেই যা প্রকাশিত হয়।

রজনীকান্তের রসবোধের প্রকৃত পরিচয় পেতে গেলে আমাদের তাঁর ফেলে আসা জীবনের দিনগুলিতে একটু দৃষ্টিপাত করা দরকার। রজনীকান্ত বাল্যকালে তাঁর জনৈক পূজনীয়া মহিলাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন –

' শ্রী শ্রী শ্রীযুতা
আমার জন্য এন এক জোড়া জুতা।।'

মাঝে মাঝেই রজনীকান্ত শিক্ষকদের লক্ষ করে সংস্কৃতে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ রচনা করতেন। চিরপ্রথামতো রচনার শুরুতে সরস্বতী স্মরণ করে তারপর তিনি নানা পণ্ডিত শিক্ষকদের বিভিন্ন দুর্বলতা নিয়ে সংস্কৃতে ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রী কালীকুমার দাস। ব্যাকরণে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু সভা-সমিতিতে তিনি ভালো বক্তৃতা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'কান্তকবি রজনীকান্ত' থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি উল্লেখ্য, – "কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন –

'ব্যাকরণে মহাবিদ্যা ব্যা ব্যা-করণতৎপরঃ।
কস্মিংশ্চিদ্ যদি বা কালে ক্রিয়তেহসৌ সভাপতিঃ।
সমারোহং সমালোক্য চরকীমাতং প্রজায়তে।'

অর্থাৎ ইঁহার ব্যাকরণ শাস্ত্রে মহাবিদ্যা কেবল ব্যা-ব্যা-করণ-তৎপর (অর্থাৎ, ব্যা ব্যা করা স্বভাব), কিন্তু যদি কোন সময়ে ইহাকে সভার সভাপতি করা হয়, তবে লোকসমাগম দেখিয়া তাঁহার চরকীমাত (ত্রাস) উৎপন্ন হইবে।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমরা ও তোমরা' নামক হাস্যরসাত্মক কবিতা ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের 'সাধনা'-য় প্রকাশিত হয়। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের 'উৎসাহ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় রজনীকান্ত 'তোমরা ও আমরা' নামক একটি কবিতায় পাল্টা জবাব দেন।

'আমরা' খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই গো,
আর 'তোমরা' বসিয়া খাও;
'আমরা' দু'পরে আপিসে লিখিয়া মরি গো,
আর 'তোমরা' নিদ্রা যাও। – দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

এর পাল্টা জবাবিতে গৃহশ্রমের মর্যাদার সপক্ষে নারীর বয়ানে রজনীকান্ত লেখেন, –

আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও;
আমরা দু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও।
– রজনীকান্ত সেন।

প্রসঙ্গত, দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা ও তোমরা' প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ১২৯৯ সালে 'সাধনা'র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তোমরা ও আমরা' নামক করুণরসাত্মক গীতি-কবিতা এর আধার, 'তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও... ...' ইত্যাদি।

'অভয়া' কাব্যগ্রন্থের ব্যঙ্গাত্মক রচনার নিদর্শনও আমাদের সমাজের দিক্‌নির্দেশ সম্বন্ধে ভাবায়। যেমন, 'পতিত ব্রাহ্মণ' কবিতায় –

'চুরি কি ডাকাতি, খুন কি জখম, যা খুশী দু'হাতে ক'রে যাই;
পক্ষী তো ভাল, রাস্তায় যদি আস্ত '...'টা ধরে খাই;
আমরা হচ্ছি জেতের কর্ত্তা, আমাদের জাত নিবে কে?
(এই) স্বার্থের পাকা-বেদীর উপরে গলা টিপে মরি বিবেকে।
বাবা এখনো ঝুল্‌ছে ব্রহ্মণ্যতেজের Leyden Jar এ পৈতে;
তোমরা মোদের সম্মান করিবে সে কথা আবার কইতে?...'

আবার, 'সমাজ' কবিতায় পাই –

'অথর্ব্ব বুড়োর সনে, সাত বছরের ক'নে
বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা;
(আবার) এমনি কিছু মোহ তক্কার, যে দু'শ শাস্ত্রী, বিদ্যালঙ্কার,
সেই বিয়ের মন্ত্র পড়ায়, উড়িয়ে টিকি জয়-পতাকা।'

না যেতে বাসি-বিয়ে, মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে,
মোছে কপালের সিঁদুর, ভাঙ্গে হাতের শাঁখা;
(তখন) মিলে সব শাস্ত্রীবর্গ, হেসে করান বৃষোৎসর্গ,
মেয়েটির একাদশীর সুব্যবস্থা করেন পাকা।...'

'ডাক্তার' কবিতায় –

'রোগটা বুঝি বা না বুঝি
আগে দর্শনী ট্যাঁকে গুঁজি...'

আবার 'মোক্তার' কবিতায় –

'...করি জামিনের ফিস আদায়,
কভু আসামীতে গোল বাধায়
ঐ বিচারের দিনে হাজির না হয়ে
হাসির দ্বিগুণ কাঁদায়।...'

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

কবির জীবনাবসানের তিন বছর পরে তাঁর নীতিকবিতার সংকলন ‘সদ্ভাব-কুসুম’ প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে, যার নামকরণ প্রসঙ্গে অনেকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ‘সদ্ভাব শতক’-এর উল্লেখ করে থাকেন, যদিও নামকরণ ছাড়া অন্য কোনও মিল এ দুটির মধ্যে পাওয়া যায় না। ‘সদ্ভাব-কুসুম’ ছাত্রপাঠ্য হিসাবে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রজনীকান্তের অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ ‘শেষদান’ নামক গ্রন্থে সংকলিত করে, যা মুদ্রিত হয় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে।

এই কবিতাগুলিতে কবির নিজেকে সেই ‘পরমসুন্দর’-এর চরণে নিবেদনের করুণ মর্মস্পর্শী আকুতি ধরা পড়েছে, যা তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণাকেও ছাপিয়ে গিয়ে রচনাগুলিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। এই গ্রন্থটিই কবির শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ।

এছাড়া রজনীকান্তের আরও তিনটি অগ্রন্থিত কবিতা পাওয়া যায়, যেমন –

(১)

পূজার প্রদীপ

(তুই) পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস হৃদয়-দেউল মাঝে।
ভক্তি প্রেমের ধূপটি জ্বালাস, নিত্য সকাল সাঁঝে।
পাবি যেদিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস মাথা,
বলিস্ “তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমার জীবন মাঝে।।”
আপনাকে তাঁর ভৃত্য রাখিস্, তাঁরে করিস্ রাজা,
তাঁর তরে তুই আসন পাতিস্, ফুলের মালা সাজা।
তবু যদি দেখা না পাস্, চোখের জলে বেদন জানাস্
বলিস্ “প্রিয়! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে।।”

কবিতাটি পেয়েছি শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত ‘ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন’ (১৯৫৯) থেকে। তাঁরা লিখেছেন যে, তাঁরা কবিতাটি পেয়েছেন ‘আনন্দময়ী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে। কিন্তু গানটি কবির কোনও কাব্যগ্রন্থেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

(২)

অনুতাপ

মোরে কে ডাকে “আয়রে বাছা আয় আয়!”
বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শুনা যায়!
মা তোমার করুণ স্বরে, আপন জনে মনে পড়ে,
যাদের ফেলি ধূলি পরে, আছি রত নিজ সেবায়!
বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শুনা যায়!
মা ও সুধাবাণী মরমে পশি, পড়ছে মনে স্নেহরাশি,
আপন দেশে পরবাসী থাকিতে মন নাহি চায়!
বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শুনা যায়!
মা তোমারে করি অপমান, লভেছি বহু যশমান,
লাজে অতি ম্রিয়মাণ এ মুখ দেখাতে তোমায়!
বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শুনা যায়!
মা ডাকিলে যদি স্নেহভাষে, রাখিও সদা তব পাশে,
তুচ্ছ ধন পদ আশে আর না যেন দিন যায়!
বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শুনা যায়!

কবিতাটি পেয়েছি সরলা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত, ‘ভারতী’ পত্রিকার বৈশাখ ১৩১১ (এপ্রিল ১৯০৪) সংখ্যা থেকে।

(৩)

সূর্যমুখী ফুল

তোমার নাম, পোড়ামুখী, সূর্যমুখী ফুল!
হা রে হা অবোধ মেয়ে,
কার পানে আছ চেয়ে,
এখনো এখনো তোর ভাঙিল না ভুল!
সুগন্ধ-সৌন্দর্য-হীনা,
তুই যে ভিখারী দীনা,
তোর যে মোটেই নাই এক কড়া মূল।
জন্মি ভিখারী ঘরে
কে এমন আশা করে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে হইবি আকুল। (প্রথমাংশ)

কবিতাটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত, প্রমথনাথ বিশী এবং ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘কাব্যবিতান’ সংকলন থেকে পাওয়া। এর প্রথম স্তবকটি এখানে তুলে দিলাম, সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়তে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বাংলা ওয়েবসাইট ‘মিলনসাগর’ (www.milansagar.com)-এ ‘কবি রজনীকান্ত সেনের রচনাসমগ্র’-এর পাতায় যেতে হবে। (ওয়েব-লিঙ্ক: http://www.milansagar.com/kobi_2/rajanikanta/kobi-rajanikantasen.html)

অবিচল ভগবদ্‌ভক্তি ও অন্তরে গভীর ঈশ্বরোপলব্ধি যে সরলপ্রাণ ভাববিভোর মানুষটির সারাজীবনের পাথেয় ছিল, সেই স্বল্পায়ু, যশস্বী, দেশ ও জাতির গৌরব, জীবনরসিক মরমি কবির চরণে রইল আমাদের প্রণতি।

গ্রন্থসূত্র:

১. *সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী* – ডঃ শিশির কুমার দাশ।
২. *দ্বিধাহীন অনুভূতির কবি* – সুধীর চক্রবর্তী, ‘*দেশ*’ পত্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সংখ্যা।
৩. বাংলা উইকিপিডিয়া।
৪. *বিশ্রাম* – রজনীকান্ত সেন।
৫. *কল্যাণী* – রজনীকান্ত সেন।
৬. *অমৃত* – রজনীকান্ত সেন।

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

৭. *কান্তকবি রজনীকান্ত* – শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
৮. রজনীকান্ত সমগ্র, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বাংলা ওয়েবসাইট ‘মিলনসাগর’ (www.milansagar.com)।
৯. *উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন* – শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত (১৯৫৯)।
১০. সরলা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত ‘*ভারতী*’ পত্রিকার বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল, ১৯০৪) সংখ্যা।
১১. *বাঙালীর গান* – দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত (১৯০৫ সালে প্রকাশিত)।
১২. ‘*কাব্যবিতান*’ সংকলন – প্রমথনাথ বিশী এবং ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৯৫৭ সালে প্রকাশিত)।

গ্রন্থসূত্র ৪, ৫, ৬ ও ৭-এর মূল ইন্টারনেট উৎস – ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক’।

লেখক ও পাঠক বন্ধুদের প্রতি

- ‘আবাদভূমি’ যাত্রা শুরু করেছে আপনাদের সাথে নিয়ে। প্রতি সংখ্যা প্রকাশিত হবে তিন মাস অন্তর। সাধারণ সংখ্যার বিনিময় মূল্য ২০ টাকা।
- ‘আবাদভূমি’-র লক্ষ্য : লোকসাংস্কৃতিক ও গণসাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ও প্রসার এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ভাবধারায় মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ।
- শিল্প, চারুকলা, সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক মননশীল ও প্রগতিশীল রচনা ‘আবাদভূমি’তে প্রকাশিত হবে। কবিতা, গান, গল্প, পদ্য/গদ্য সাহিত্যের অনুবাদ, রম্যরচনা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনী, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ (ধ্রুপদী বা লোকায়ত শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা এবং ধ্রুপদী বা লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ) ইত্যাদি আপনার পছন্দের যেকোনও লেখার জন্য হাতে কলম তুলে নিতে পারেন। পদ্যে বা গদ্যে শব্দের সেই সোনালি ফসল পাঠিয়ে দিন ‘আবাদভূমি’-র ঘরে। কোনও পত্রিকায় মুদ্রিত না হয়ে, শুধু ইন্টারনেটে প্রকাশিত কোনও লেখাও পাঠাতে পারেন। লেখার সাথে ফোটো / ছবি / স্কেচ ইত্যাদি পাঠালে JPEG বা TIFF ফরম্যাটে ডিজিটাল ইমেজ করে ই-মেলে বা ডাকযোগে সিডিতে পাঠাবেন।
- লেখা পাঠাবেন সাদা কাগজের একপিঠে দু’পাশে যথেষ্ট মার্জিন রেখে কালো বা নীল কালিতে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা টাইপ করে। লেখার শেষে আপনার নাম, সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেল ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। আমাদের ডাক-যোগাযোগ: রাজেশ দত্ত, সম্পাদক, ‘আবাদভূমি’, তারাপদ দাস লেন, কলুপুকুর, চন্দননগর, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২১৩৬।
- আনুমানিক শব্দ সংখ্যা : গল্প - অনধিক ২০০০ এবং প্রবন্ধ - অনধিক ২৫০০ শব্দ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক খবরাখবর, নতুন বইপত্র বা লিটল ম্যাগাজিনের পরিচিতিও অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাতে পারেন।
- আপনার লেখা মনোনীত হলে যত শীঘ্র সম্ভব আপনাকে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে। অনুগ্রহ করে মূল লেখার ফোটোকপি রেখে পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। – সম্পাদকমণ্ডলী, আবাদভূমি।

যে স্টলগুলিতে ‘আবাদভূমি’ নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে

পাতিরাম (কলেজ স্ট্রিট), বুকমার্ক (কলেজ স্ট্রিট), বই-চিত্র (কলেজ স্ট্রিট, কফি হাউস), ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রিট), মনীষা (কলেজ স্ট্রিট), পিপলস বুক সোসাইটি (পি.বি.এস, কলেজ স্ট্রিট), নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট (এন.এইচ.বি.টি, কলেজ স্ট্রিট), অফবিট (কলেজ স্ট্রিট), জ্ঞানের আলো (যাদবপুর), কল্যাণ ঘোষের স্টল (রাসবিহারী মোড়), সুনীলবাবুর স্টল (উল্টোডাঙ্গা), বেলঘড়িয়া স্টেশন, কাঁচড়াপাড়া স্টেশন, নৈহাটি স্টেশন ও অন্যান্য আরো অনেক বইয়ের স্টলে।

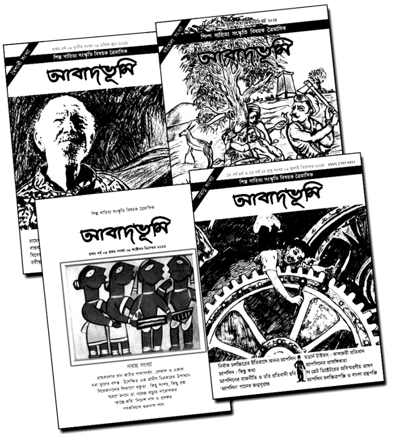

যোগাযোগ করুন : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (দূরভাষ: ৯২৩০৬১২৬৫৫), চিররঞ্জন পাল (দূরভাষ: ৯৪৩৪৫১৬৮৯৮)।

ইমেল : abadbhumi@gmail.com ‘আবাদভূমি’র ফেসবুক পাতায় আপনার মতামত জানান। ভালো লাগলে পেজের ‘লাইক’ বোতামে ক্লিক করে আপনার বন্ধুদের শেয়ার করুন। ‘আবাদভূমি’র ফেসবুক লিঙ্ক : https://www.facebook.com/abadbhumi

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)